স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক

এম বাহাউদ্দিন

email: probashi_writer@yahoo.ca

এম. বাহাউদ্দিনের উপন্যাস 'স্বপ্ন নগরী নিউইয়র্ক' ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রকাশ করছি প্রতি রবিবার। ১০ টি পর্বে প্রকাশিতব্য এই উপন্যাসটির পর্ব-৯ আজ রবিবার, মে ০১, ২০০৫ এ প্রকাশিত হলো। আপনার মতামত লেখককে জানান এই ঠিকানায়ঃ probashi_writer@yahoo.ca –সম্পাদক

৯ম পর্ব

পূর্ব প্রকাশিতের পর...

-৬৩-

প্রবাসে যাদের ছোট ছেলেমেয়ে আছে তাদের স্বপ্ন ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে বড় হোক। উন্নতির শেষ ধাপে পৌঁছে যাক। বেশির ভাগ মাতাপিতার ইচ্ছা ধর্মকে উপেক্ষা করা যাবেনা। নিজের ধর্ম জানতে হবে এবং শিখতে হবে। এদেশের শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষাকে তারা সমান গুরুত্ব দেন। তাই ধর্ম শিক্ষার জন্য তারা শিক্ষক নিয়োগ করেন। যদিও মাতা পিতা ইচ্ছে করলে নিজেরাই শিখাতে পারে। নিজেরা শিক্ষা না দিয়ে একজন মৌলভী নিয়োগ করেন। আর এসব মৌলভী বলতে এখানকার মসজিদের ঈমামই যোগ্য ব্যক্তি।

প্রতিটি মসজিদের ঈমাম মাসিক বেতন পান। তার বাইরে তাদের বেশ বড় একটা আয় আছে। সেটা হল ছেলেমেয়েদের আরবী শিক্ষা দিয়ে। তারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে সময় নির্ধারণ করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। নামাজের সময় বাদ দিয়ে তারা প্রতিটি মিনিট এই কাজে ব্যবহার করেন।

ব্রুকলীন মসজিদের ঈমাম মৌলানা আব্দুল কাদের বেশ কয়েকটা বাসায় বাচ্চাদের আরবী শিক্ষা দান করেন। বাদ মাগরিব তিনি এক বাসায় এগার বছরের একটি মেয়ে কচিকে শিক্ষা দান করে আল্লাহর পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

কচির বাবা কাজ করেন একটা পার্কিং লটএ। বেলা দুটা থেকে রাত দশটা। সেদিন ঈমাম সাহেব লিভিং রুমে কচিকে পড়াচ্ছেন। কচির মা রান্না করতে গিয়ে দেখেন মরিচের গুড়ো শেষ। কচির বাবা ঝাল খায়। তিনি ভাবলেন নিজেই নিয়ে আসবেন বাঙালী গ্রোসারী থেকে। বেশি দূর

নয়। কয়েকটা ব্লক। তিনি বেরিয়ে যাবার সময় কচিকে বলে গেলেন গ্রোসারীতে যাচ্ছেন।

গ্রোসারী করে দোকান থেকে বেরিয়েই পড়ে গেলেন রুমা ভাবীর সামনে। রুমা ভাবী তার খুশীর খবরটা না দিয়ে স্থির থাকতে পারছেন না। বললেন, আমি আপনার বাসায় যেতাম। ভালই হল দেখা হয়ে গেল। আমাদের রাজিবের খবর শুনেছেন?

কি খবর? কিছু তো শুনিনি।

আমার ছেলে প্রেসিডেন্ট পুরষ্কার পেয়েছে! স্কুলে তাকে নিয়ে কত বড় ফাংশান হয়ে গেল! আমাদেরও দাওয়াত ছিল। সে কি আনন্দ! সব টিচার তাকে নিয়ে কি যে আনন্দ করেছে!

রাজীব রুমা ভাবীর চৌদ্দ বছরের ছেলে। অষ্টম শ্রেনীতে খুব ভাল রেজাল্ট করার জন্য প্রেসিডেন্ট পুরষ্কার পেয়েছে। প্রায় সব স্কুলেই সেরা ছাত্রদের পুরষ্কারের ব্যবস্থা আছে। অনেক ধরনের পুরষ্কার। অনার রোলের পুরষ্কার, গিফটেট চাইল্ড পুরষ্কার, প্রেসিডেন্ট পুরষ্কার। এসব পুরষ্কার বাঙালী অনেক ছেলেমেয়েরা পেয়েছে। রুমা ভাবী একই খবর বার বার বললেন।

কচির মা ঘরে ফিরে দেখেন ঈমাম সাহেব চলে গেছেন। কচি তার পায়জামায় রক্তের দাগ মুছতে চেষ্টা করছে। রক্ত দেখে কচির মা একবারে থ হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন কিভাবে রক্ত লাগল। কচি কেঁদে ফেলল। বলল, হুজুরে আমাকে .....

কচির বাবা ঘরে ফিরে শুনে হতবম্ভ হয়ে গেলেন। বল কি! এখনই আমি পুলিশ কল করছি। কারও সাথে কোন পরামর্শ দরকার নেই। কাউকে বলারও প্রয়োজন নেই। এদেশে ধর্ষন খুবই স্পর্শকাতর ব্যাপার। বিশেষ করে নাবালিকাকে ধর্ষন। এসব মামলায় কম করে দশ বছর জেল। এ ধরনের মামলায় কোন সাক্ষী লাগে না।

রাতেই হুজুরকে পুলিশে নিয়ে গেল। কেউ জানে না কেন পুলিশ নিয়ে গেল। মসজিদ কমিটি পরের দিন খোঁজ নিল। তাকে কোন জামিন দেয়া হবেনা। গোপন খবর গোপন না রেখে পত্রিকাগুলো সব ফাঁস করে দিয়েছে। শুধু তাই নয় সেই খবরের সাথে আরও একটা লম্বা খবর ছাপিয়ে দিয়ে মানুষকে অবাক করে দিয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস-এর বরাত দিয়ে। খবর হল:

১২৭ জন ধর্মযাজকের বিরুদ্ধে যৌন কেলেঙ্কারির মামলা। ২৩জন গ্রেফতার। গ্রেফতারকৃতদের কয়েকজন স্বীকার করেছে তারা শিশুদের সাথে যৌন সঙ্গম করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশে। বেশির ভাগই চার্চের ভেতর। দুজন বলেছে তারা মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সাথে যৌনকর্ম করে বেশি তৃপ্তি পায়। কেউ আবার কোন মেয়েকে ধর্ষন করেনি। শুধু ছেলেদের ধর্ষন করেছে। চল্লিশ/পঞ্চাশ বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা কেউ ভুলে যায়নি। ধর্ষিতদের কেউ কেউ এখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তারাও আজ এসব খবর দেখে এগিয়ে আসছে। নতুন নতুন মামলা হচ্ছে। টাইমসের ধারনা এর সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যাবে। পৃথিবীব্যাপী ধর্মযাজকদের কর্মকান্ডের প্রতিবাদ হচ্ছে। বিশেষ করে যৌন কেলেঙ্কারীর প্রতিবাদ। কোন ধর্মযাজক এখন নব্বইএর কোঠায়। তারাও রেহাই পাবেনা। পঞ্চাশ বছর পরও এসব মামলা করার মেয়াদ আছে। আরও কত রকমের মামলা হবে তার অপেক্ষায় আছে পাঠক।

সব ধর্মের ধর্মযাজকরা এসব কুকর্ম করার সময় বলে, আল্লাহ বা ভগবান বা ঈশ্বর সব ক্ষমা করে দেন। তিনি দয়ালু, ক্ষমাশীল।

এর পরদিনই সৈয়দ সাহেব হজ থেকে ফিরলেন। আলহাজ উপাধি ধারণ করে। তার অফিসের লোকজন, বন্ধুবান্ধব অনেকেই এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে। তিনি সম্পুর্ন নতুন মানুষ হিসেবে কেনেডী এয়ারপোর্টে অবতরণ করলেন। মাথা সউদি রুমালে ঢাকা। শুধু মুখটা দেখা যায়। পড়নে লম্বা সৌদি কোর্তা, হাতে তজবিহ্। অপেক্ষমান সকলের সাথে তিনি কোলাকুলিশেষে ঘরের দিকে রওয়ানা দিলেন। তার জন্য তিনটা গাড়ী অপেক্ষা করছে। তিনি ঘরে পৌঁছলেন।

যারা এয়ারপোর্টে যেতে পারেনি তারা বাসায় অপেক্ষা করছে। হাজি সাহেবের সাথে মোলাকাত করাও সওয়াবের কাজ। তিনি নবীর দেশের মাটি মাড়িয়ে এসেছেন। আগত অতিথিদের সাথে আলাপ করে তার বেশ সময় চলে গেল। অনেকক্ষণ পর তিনি অন্দর মহলে গেলেন।

লতা জানে সে আজ আসছে। তার জন্য এমন বিশেষ কোন খাবারের ব্যবস্থা করেনি। রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। সৈয়দ সাহেব সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ?

কোন উত্তর নেই।

কোন অসুবিধা হয়নি তো?

না, আমার কোন অসুবিধা হয়নি। অসুবিধা হচ্ছে জেমস এবং তার মায়ের।

জেমস?

হ্যাঁ, জেমস এবং তার মা এসেছিল টাকার জন্য। তারা ঘরভাড়া দিতে পারেনি। তোমার নাকি দেবার কথা ছিল। তুমি না দিয়ে চলে গেছ।

ওহ্হো! ওদেরকে আমি সাহায্য করি। মহিলার কাজ নেই। অসুবিধায় আছে। তাই মাঝে মাঝে কিছু দেই।

কেন, ওদের প্রতি তোমার এত দয়া কেন?

দয়া তো আমি আরও মানুষকে করি। বাংলাদেশে কত মানুষকে সাহায্য করি তা ত তুমি জান। জেমসকেও সে রকম সাহায্য করি।

বাংলাদেশে সৈয়দ কিছু মানুষকে সাহায্য করে। তবে সোজাভাবে নয়। তার বছরে যা আয় হয় তার থেকে জাকাত দিতে হয়। জাকাতের টাকা তিনি বেশির ভাগ সময় বরবাদির হাতে দেন। তাছাড়া এখানে জামাত ভাইরা যে যা পারে প্রতি মাসে একটা চাঁদার মত জমা করে। আল্লাহর কাজের জন্য। বরবাদি যেখানে যাকে দেয়া প্রয়োজন মনে করে সেভাবেই বিতরণ করে। কত টাকা কিভাবে কোথায় যায় তার হিসাব নেয়া বা দেয়া প্রয়োজন নেই। কারণ হুজুর যেখানে নিজে দেখাশুনা করছেন সেখানে হিসাব নেয়া মহা অন্যায়। হুজুর যাদেরকে সাহায্য করেন তাদেরকে কোনদিনই বলেন না যে, এটা কোথাকার বা কিসের টাকা। অথচ নিয়ম হল, জাকাতের টাকা বিলি করার সময় গ্রহিতাকে জানাতে হয় এ টাকা জাকাতের অংশ। তখন গ্রহিতার ইচ্ছা এ টাকা গ্রহন করা বা না করা। বরবাদি এই টাকা দিয়ে নিজের এবং আখেরাতের কাজ করেন। এই টাকা দিয়ে মানুষ হাত করেন। যারা বরবাদির কাজকর্ম পছন্দ করে না তাদেরকে তিনি টাকা দিয়ে হাত করে নেন। এভাবে বরবাদির হাত, তার নেটওয়ার্ক দিন দিন বাড়ছে। ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে।

জেমসকে তুমি সে রকমই সাহায্য কর? আর কিছু নয়?

না, আর কি আছে?

লতা অনেকটা চিৎকার করে উঠল! তুমি মিথ্যাবাদি! হজ্ব করে এইমাত্র না এসে পৌঁছলে! এর মাঝেই এমন একটা জাজ্বল্যমান মিথ্যা

বলতে পারলে! আমার কাছে অনেক কিছু গোপন করেছ! টুপির আড়ালে তোমার আসল চেহারা লুকিয়ে আছে! তোমার আসল রূপ কি?

সৈয়দ এ ধরণের পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলনা। কল্পনায় ছিল সে বাড়ী ফেরার সাথে সাথে লতা এগিয়ে আসবে তার কাছে। তার পছন্দের খাবার তৈরি করে সাজিয়ে রাখবে, হাতের কাছে তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এত বড় একটা কাজ করে এসেছে তার জন্য আলাদা একটা সন্মান পাবে। ঘরের পরিবেশ বদলে যাবে। এ যে সম্পুর্ণ অন্য লতা কথা বলছে, অন্য সুরে! সব ফাঁস হয়ে গেছে! কিন্তু কিভাবে? তখনই তার মনে পড়ল ক্রিস্টিনার চেকের কথা। কবে দেয়া হয়েছিল শেষ চেক? তাইত! ছয় মাস হয়ে গেছে। সৈয়দ বুঝতে পারল ধরা খেয়ে গেছে। সৈয়দ জানে বাংলাদেশ হলে একটা ধমক দিয়ে সব ঠান্ডা করে দিতে পারত। এখানে তা সম্ভব নয়। ধমক দিলে বিপদ হতে পারে। এখানে অনেক ঘটনার কথা সে জানে। চতুর সৈয়দ তখন সুর পাল্টে ফেলল। বলল, আচ্ছা এ ব্যাপারে পরে কথা হবে। আমি এখন বড় ক্লান্ত। আমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। তোমার সব কথা শুনব। যা বলবে তাই করব। এখন আমাকে বিশ্রাম নিতে দাও। বলে সে লিভিং রুমে চলে এল। মনে হল যেন পালিয়ে বাচল। আগত মেহমানদের মক্কাশরীফের তবারুক দিয়ে, আবে জমজমের পানি ছোট ছোট শিশিতে ভরে সবাইকে একটু একটু করে দিলেন। হাজি সাহেব থেকে ছওয়াবের অংশ নিয়ে মেহমান বিদায় হতে অনেক রাত হয়ে গেল।

ছওয়াব কামাই করার অনেক পথ আছে। শুধু কায়দা জানা দরকার।

ছওয়াব কামাই করে সৈয়দ সাহেব ঘুমাতে এসে দেখে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর খোলেনি। তিনি চলে গেলেন শান্তর রুমে।

-৬৪-

ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হবার পর পরই আনিস একটা কোম্পানীতে যোগদান করেছে। শেষ বর্ষে থাকাকালিন অনেক দরখাস্ত করেছিল। এসব ব্যাপারে চাচী খুবই সচেতন। কখন কোন্ কোন্ কোম্পানীতে দরখাস্ত করতে হবে তিনিই সব সময় আনিসকে উপদেশ দিয়ে আসছেন। দু জায়গায় অফার পেয়েছে। আইটি কনসাল্টেন্ট হিসেবে কম্পিউটার টাস্ক গ্রুপে যোগদান করেছে। বেতন বছরে ৭৫ হাজার ডলার। প্রথম দিন অফিস শেষে বাহারের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হল। অসময়ে। বাহার বাসায় নেই। বিন্দুকে বলল, আমি একটা সুখবর দেব, তার বদলে কি খাওয়াবেন বলুন।

সুখবর যারা বহন করে তারা তো মিষ্টি নিয়ে আসে। আপনার হাতে তো কিছু দেখছিনা। মনে হয় সুখবর খুব বড় কিছু নয়।

মিষ্টির প্যাকেট তো ডাইনিং টেবিলে। এত বড় প্যাকেট কি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায়? জ্যাকশন হাইটস থেকে আলাউদ্দিনের মিষ্টি নিয়ে এসেছি।

বিন্দু তাকিয়ে দেখল সত্যি সত্যি টেবিলে তিনটা বড় বড় প্যাকেট। আরে তাই তো! তাহলে সত্যিই ভাল খবর। আর সে খবরটা নিশ্চয়ই তোমার চাকরির খবর?

ঠিক ধরেছেন। আজ যোগদান করলাম। এখন বসতে পারব না। চাচার বাসায় যেতে হবে। সেখানেও মিষ্টি পৌঁছাতে হবে। তারপর লতা ভাবীর বাসায়। আমানের বাসায়। এতগুলো কাজ তো একা করতে

পারবনা। তাই আবুল ভাই সার্ভিস দিচ্ছে। আবুল ভাই গাড়ীতে বসে আছেন। এখন চলি। কাল আবার আসব।

আবুল ভাই সার্ভিস দিচ্ছে। কিন্তু মাগনা নয়। তার ব্যবসা মাগনা সার্ভিস দিয়ে সিন্দুকে হাত দেয়া। আবুল ভাই ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট। মেট লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ করেন। অনেকে বলে মেটলাইফের ব্রুকলীন ব্রাঞ্চটা বাঙালীর। আলী ম্যানেজার। সিলেটের অধিবাসি। একটা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার হওয়া মানে বছরে মিলিয়ন ডলার আয় করা। সিলেটের অধিবাসির একটা গুণ এই যে, তাদের এলাকার মানুষ কোন ব্যবসা শুরু করলে তারা অন্ধভাবে সহযোগিতা করে। পাঁচ বছর আগে আলী যখন এজেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করে তখন প্রতিটি সিলেটবাসী লাইফ ইন্সিওরেন্স করেছে। তাদের স্থানীয় ভাষায় যখন কথা বলে যে, জীবনের নিরাপত্তার জন্য আপনার একটা ইন্সিওরেন্স দরকার। তখন তারা বলে কি করতে হবে, কোথায় সই করতে হবে আপনি একটা করে দিন। আলী তার সুবিধা মত সব ঠিক করে একটা সই নিয়ে যায়। মাসে মাসে তারা তাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য এক দু'শ ডলার জমা দেয়। এই এক দু'শ ডলারে আলীর কত ইনকাম হয় তা কেউ জানে না। প্রথম বছরই দেখা গেল সমস্ত কোম্পানীতে আলী টপ প্রডিউসার। দু'লাখ বিশ হাজার তার ইনকাম। পর পর তিন বছর সে টপ প্রডিউসার। চতুর্থ বছরে আলী ম্যানেজার। এখন তার ইনকাম বছরে মিলিয়ন ডলার। যে সব বাঙালী লেখাপড়া জানে অথচ ভাল কাজ পাচ্ছে না তারা আলীর টিমে যোগ দিল। কয়েক শ এজেন্টের মাঝে বাঙালী একশর উপর। তার একজন আবুল ভাই।

এই এজেন্টদের কাজ হল মক্কেল ধরা। সব রকমের সভা সমিতিতে যাওয়া, মানুষের সাথে পরিচয় করা, ফ্রি সার্ভিস দেয়া, টোপ ফেলা ইত্যাদি। এই টোপকে ইংরেজিতে বলে 'প্রসপেক্টিং' করা। টোপ গেলার পরই হয় ক্লায়েন্ট। আনিসের সাথে আবুলের পরিচয় দু'বছর আগে। আবুল জানে আনিস লেখাপড়া শেষ করলে ভাল একটা চাকরি পাবে। আর তখনই জবাই করবে। সব সময় যোগাযোগ রাখে। আনিস চাকরি পেয়েছে শুনে আবুল এসে হাজির ফ্রি সার্ভিস দেবার জন্য। আনিসকে প্রস্তাব দিয়েছে হাফ মিলিয়ন ডলারের ইন্সিওরেন্স করার জন্য। তাতে আবুলের কমিশন আসবে প্রায় পঁচিশ হাজার ডলার। প্রাথমিক কমিশন। তারপর যতদিন প্রিমিয়াম চলবে ততদিন ৪% আসতে থাকবে। একজন করণিকের এক বছরের বেতনের সমান। এক কোপেই।

এই কোপ দেয়াটা সকলে সমান ভাবে পারদর্শি নয়। কোপ দেয়ার জন্য ট্রেনিং দেয়া হয়। কোম্পানীর খরচে। কয়েক সপ্তাহের জন্য পাঠিয়ে দেয় মেটলাইফ ইউনিভার্সিটি নিউজার্সিতে। সেখানে হোটেলে থাকবে, ট্রেনিং নেবে। মানুষ জবাই করার ট্রেনিং। এ জবাই কিন্তু বাংলাদেশের জামাতের ক্যাডারদের জবাই নয়। এ জবাই কলমের জবাই, কাগজের জবাই, মুখের জবাই। যার মুখ যত ধারাল, যে যত বেশি ট্রেনিং রপ্ত করেছে তারা তত পারদর্শি। সহজেই কৃতকার্য হয়ে যায়। আবুলের মুখটা খুব ধারাল। চিতাবাঘের মত। যে শিকারের পেছনে একবার দৌঁড় দিয়েছে তাকে কাবু না করে থামবে না। শিকারের উপকার করে ছাড়বেই। আবুল যেসব কথা বলে কাবু করে তার একটা নমুনা দিচ্ছি: মানুষ কখন মারা যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আপনি মারা গেলে আপনার স্ত্রীপুত্রকন্যার কি হবে? তাদের নিরাপত্তার জন্য আপনার একটা পলিসি চাই। আপনি যা জমা করবেন সবই আপনার থাকবে। দশ বছর

পর আর কোন প্রিমিয়াম দিতে হবেনা। তখন আপনার ক্যাশ ভ্যালু এত এত হবে বলে একটা কাগজে লিখে তার সামনে তুলে ধরে। এই যে টাকাটা জমা হল তা আপনার নিজের টাকা, সেটা আপনি যখন ইচ্ছে তুলে নিতে পারেন। আবার আস্তে আস্তে ফেরত দিয়ে দিতে পারেন। এতে আপনার পরিবার সম্পুর্ণ নিরাপদ। আপনি মারা গেলেও কোন অসুবিধা নেই। তারপর একটা উদাহরণ দেয়। এই যে আমাদের করম আলী ভাই মারা গেলেন তার পলিসি আমিই করেছিলাম। তার পরিবার আড়াই লক্ষ ডলার পেয়েছে। এই দেখুন পত্রিকার খবর। এই বলে সে কয়েকটা বাংলা পত্রিকা বের করে দেখায়। এসব কথা শুনার পর প্রসপেক্ট হিপনোটাইজড হয়ে যায়। মনে করে খুব শীঘ্রই সে মারা যেতে পারে।

আসলেই একজন বাঙালী অকালে মারা গেছেন। আসলেও আবুলই তাকে জবাই করেছিল। আসলেই তার পরিবার আড়াই লক্ষ ডলার পেয়েছে। আসলেও জীবন বীমার প্রয়োজন আছে। একটা জীবন বীমা থাকলে পরিবারের একটা নিরাপত্তা থাকে। করম আলী ভাই তার উদাহরণ। কিন্তু আবুল যা বলেনি বা এজেন্টরা যা বলে না তা হল, নিজের ক্যাশ ভ্যালু থেকে টাকা নিলে তা সুদ সহ ফেরত দিতে হবে। সময় মত ফেরত না দিলে পলিসি বাতিল হয়ে যাবে। পলিসি বাতিল হলে যে টাকা জমা হয়েছে তা থেকে কোম্পানীর সমস্ত খরচ কর্তনের পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে ফেরত পাওয়া যাবে। যাদের পলিসি বাতিল হয়েছে তারা টাকা ফেরত পেয়েছে বলে কোন উদাহরণ খুব একটা নেই। মক্কেলরা এত গভীরে যায় না। তারা দেখে মিলিয়ন, হাফ মিলিয়ন ইত্যাদি অংক। নিজের টাকা থেকে টাকা নিলে আবার সুদ কিসের এবং কেন এ প্রশ্ন কেউ খুব একটা করেনা।

এই ব্যবসায় সবাই প্রথম প্রথম ভাল করে। পরিচিত মহল শেষ হয়ে গেলে আর বেশি একটা মক্কেল মিলেনা। তারপর আস্তে আস্তে অনেকেই ছেড়ে দেয়। অন্য কাজে লেগে যায়।

আবুলকে নিয়ে সেদিন সব মিষ্টি বিতরণ করল আনিস। আমানের বাসায় দু'জনে রাতে খেয়ে দেয়ে গেল লতার বাসায়। অবশ্য আমানকে আগেই জবাই করা হয়েছে। ফ্যামিলি প্রগ্রাম নামে একটা প্রগ্রাম দিয়েছে যাতে স্বামীস্ত্রী দু'জনেই কভারড, প্রিমিয়াম কম। হাফ মিলিয়ন ডলার তার সীমানা।

সৈয়দ সাহেব তখন তার পেয়ারের মানুষের সাথে লিভিং রুমে ব্যস্ত। আনিসকে দেখে একটু তাচ্ছিল্যভাবে তাকাল। মিষ্টির প্যাকেট দেখে বুঝতে পারল কোন একটা ভাল খবর। অনিচ্ছাসত্ত্বে জিজ্ঞেস করল, তোমার পরীক্ষার খবর নাকি?

না, চাকরির খবর।

কোথায় যোগদান করলে?

কম্পিউটার টাসক ফোর্সে।

ওটা তো বিরাট কোম্পানী। নিশ্চয়ই বেতন ভাল দিয়েছে?

হ্যা, আমার ভালভাবেই চলে যাবে।

কি এনেছ? ঐ টেবিলে রাখ।

আনিস টেবিলে রাখেনি। সোজা রান্নাঘরে চলে গেল। কেউ নেই। শান্তর রুম বন্ধ। লতার বেডরুম ভেজানো। আস্তে করে টোকা দিল। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল, কে?

আমি পূজারী। দেবীর দরবারে পূজা দিতে এসেছি।

দরজা খুলে লতা জিজ্ঞেস করল, এত রাতে তুমি!

এই সামান্য কিছু মিষ্টি নিয়ে এসেছি। দেরী করলে আনন্দটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। তাই এই রাতেই নিয়ে আসতে হল।

এখানে না এনে তোমার ওখানে বসেই আনন্দটা বেশি হত।

এখানেও হবে, আমার ওখানেও হবে। কাল আমার ওখানে।

কোন কোন মানুষের চোখ হাসে, চোখের পাতা হাসে, গাল, কান, কানের লতি নাচে। মুখে হাসি না ফুটলেও বুঝা যায় তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাসছে। নাচছে। এ আনন্দ প্রকাশ হয় না। প্রকাশ করে না। চোখ থাকলে কেউ কেউ দেখে।

লতা আনিসের হাত থেকে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে বলল, চল ডাইনিং টেবিলে। তোমাকে তো এখানে এই আনন্দ প্রকাশে তদারকি করবে না কেউ। আগে তুমি মুখে দেবে, তারপর আমি খাব।

ডাইনিং টেবিলে বসে দুজনে মিষ্টি খেয়ে লিভিং রুমে পাঠিয়ে দিল।

ঘরে ফিরার পরই বাহারের টেলিফোন।

কনগ্রেচুলেশনস! এবার জীবন উপভোগ কর। চার বছর কষ্ট করেছ। এখন সারাজীবন সুখভোগ কর।

ধন্যবাদ, বাহার ভাই।

এবার একটা কাজ কর। একটা বাড়ী কিনে নাও।

না, আগে গাড়ী কিনব। তারপর বাড়ী।

কি গাড়ি কিনবে?

আনিসের স্বপ্ন ছিল বিরাট অফিস, বিরাট বাড়ী, মার্সিডিস গাড়ী, সেক্রেটারী ইত্যাদি। বলল, মার্সিডিস কিনব।

এখানে গাড়ী বাড়ী কেনা কিছুই না। সামান্য ডাউন পেমেন্ট দিলেই কেনা যায়। গাড়ী কিনলে রতনের সাথে যোগাযোগ কর। সামান্য কিছু কম করে দেবে। কিন্তু রাখবে কোথায়? এখনই তোমার গাড়ীর প্রয়োজন আছে কিনা ভেবে দেখ।

পরে চাচাকে কল করল। চাচা চাচী দু'জনেই বললেন, এই মুহূর্তে গাড়ী প্রয়োজন নেই। আগে বাসা বদল কর। তোমার মা আসার আগেই। আসতে বেশ সময় লেগে যাবে। তার মাঝে বাসা ঠিক করে গাড়ী কিন।

আনিস থেমে গেল।

চলতে চলতে মাঝে মাঝে থামতে হয়।

-৬৫-

জাহাঙ্গির হসপিটালে। একটা কিডনী নষ্ট হয়ে গেছে। বাঙালী কমিউনিটিতে খবরটা ছড়িয়ে গেছে। হসপিটালে বাঙালীর ভীড়। তাকে এক নজর দেখার জন্য। বন্ধুবান্ধব পরিচিত অপরিচিত সকলে। তাকে কি ভাবে কি দিয়ে সাহায্য করা যায়! সকলের মুখে একই কথা। অনেকে একটা কিডনী দিতে প্রস্তুত। ডাক্তার বলেছে মানুষ একটা কিডনী নিয়ে অনায়াসে বাঁচতে পারে। আর একটা কিডনী এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই। তার একটা কিডনী ফেলে দেয়া হল।

এই প্রবাসে বউ সাবধান কথাটা মিথ্যা প্রমাণিত করেছে পারুল। এমন অনিন্দ সুন্দরী মহিলার জন্য এখানে মানুষের অভাব নেই। যেখানে সেখানে যখন তখন লম্পটজাতীয় পরিচিত মানুষ টোকাও দিয়েছে বহুবার। কিন্তু পারুল সম্পুর্ণ ভিন্ন স্বভাবের। জাহাঙ্গীর দু'সপ্তাহ হসপিটালে ছিল। এই দু সপ্তাহ পারুল একদিনের জন্যও বাসায় আসেনি। তার দু'বছরের একমাত্র ছেলে পাশের বাসার মহিলার

হেফাজতে রেখে রাতদিন জাহাঙ্গিরের সেবা করে গেছে। হসপিটালের নার্সরা তার কাছে অনেক কিছু শিখেছে। তারা অবাক হয়েছে একজন স্ত্রী স্বামীর জন্য কি করতে পারে। যেসব সেবাকাজে নার্সরা পরিচিত নয়। পারুলের কাজকর্মে অনেক বাঙালী মহিলাও বেশ কিছু শিক্ষা নিয়েছে। যাদের উড়াল উড়াল ভাব ছিল তাদের কারও কারও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আর উড়াল দেয় নিজেদের পরিচিত মহলে, বিশেষ করে স্বামীর বন্ধুদের সাথে। এখানে নাম প্রকাশ থেকে বিরত রইলাম।

সকলে এক বাক্যে বলল, জাহাঙ্গিরের স্ত্রী ভাগ্য। এমন স্ত্রী মিলা ভাগ্যের ব্যাপার। সকলের স্ত্রী ভাগ্য সমান নয়।

জাহাঙ্গির এখন একটা কিডনী নিয়েই বেঁচে আছে।

জাহাঙ্গিরের বাসা থেকে ফিরতে বেশ দেরী হয়ে গেল আনিসের। অফিস থেকে সোজা চলে গিয়েছিল জাহাঙ্গিরের বাসায়। সেখানে অনেক মানুষ। সবাই দেখতে আসে। ঘরে ফিরতে বেজে গেল প্রায় আটটা। ঘরে ঢুকেই দেখে লতা ভাবী বসে আছে ছেলে নিয়ে।

কখন এসেছেন ভাবী? আমি দু:খিত, রোগি দেখতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল। এ সময় আপনি আসবেন জানলে আগেই চলে আসতাম।

আনিসের ঘরের একটা চাবি এখন লতার কাছে থাকে। যখন তখন আসতে পারে। লতা এখন আর কোন নিয়ম কানুন মেনে চলে না। যখন ইচ্ছে বাইরে চলে আসে, যখন ইচ্ছে ঘরে ফিরে। তবে প্রতিদিন দশটার আগেই ফিরে যায়। ছেলের জন্য। সৈয়দ সাহেব যত রকমের সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছে, যত রকমের যুক্তি তর্ক দেখিয়েছে, সুযোগ সুবিধার কথা বলেছে কোনটাই লতার মনপূত হয়নি। সে এখন অসহযোগ আন্দোলন করছে। নীরব আন্দোলন। কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। ঘরের কোন কাজই সে ঠিকমত করে না। এক মাত্র ছেলের কাজকর্ম ছাড়া। রান্নাবান্না করেনা। ক্ষিধায় অতিষ্ট হয়ে গেলে ফ্রিজে যা পায় তাই কিছু মুখে দেয়। এখন একটা নিয়মে দাড়িয়ে গেছে সৈয়দ সাহেব বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসে। ইন্ডিয়ান হালাল রেষ্টুরেন্ট থেকে। লতা এসব মুখে দেয় না। যখন তখন বিন্দুর ওখানে বা আনিসের কাছে গিয়ে সময় কাটায়। সুখ দুখের কথা বলে।

স্ত্রীর যাতনা অসহনীয়। নীরব যাতনা। মুখে কোন কথা নেই, ঝগড়া ঝাটি নেই। ঘৃণার যাতনা। কাজশেষে সৈয়দ ঘরে আসে। নিজের কাজ নিজেই করে নেয়। বিছানা আলাদা হয়ে গেছে। বর্তমান লতার সাথে আগের লতার কোন মিল নেই। যখন তখন লতাকে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রন জানায়। যা কোন দিন কল্পনা করা যায়নি। অপরাধি দুর্বল থাকে। এখন আর তর্ক হয় না। কথা কাটাকাটি হয় না। লতার সব কথা সে মানতে রাজি। লতা যেভাবে চায় সেভাবেই তাল দিয়ে চলেছে। সৈয়দ ভেবেছে কিছুদিন গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তার ধারণা রাগ এক সময় ঠান্ডা হয়ে যাবে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এই যাতনা থেকে রেহাই পাবার কোন পথই সে খুঁজে পায় না। শুধু নামাজের পর দোয়া করা আল্লাহ যেন লতার মতি গতি ঠিক করে দেন। লতা সৈয়দের কোন নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা করে না। সে যেন এখন বাঁধন ছাড়া, ঘর ছাড়া। বিন্দুর কাছে পরামর্শ চায়। বিন্দু বলে তোমার ব্যাপার তোমাকেই ভাবতে হবে। এসব কাজ অন্যের বুদ্ধিতে ভাল হয় না। মাঝে মাঝে বলে, আনিসের সাথে পরামর্শ কর। সে ভাল বুদ্ধি দিতে পারবে। আনিসের কাছেও পরামর্শ চায়। আনিস কোন পরামর্শই দিতে পারে না। কি উপদেশ দেবে সে নিজেই জানে না।

লতা ভাবছে দেশে যাবে। সৈয়দের ঘর, সৈয়দের কাজকর্ম, এমন কি সৈয়দের ছায়া পর্যন্ত তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। একই কথা প্রায় প্রতিদিন বলে। আনিস শুনে। আর এক জনের বিবাহিত স্ত্রীকে সে কি উপদেশ দেবে সে জানে না। যেখানে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সেখানে নিজেদের সিদ্ধান্তই সঠিক সিদ্ধান্ত। অপরের সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে। তাই আনিস বলে, মানিয়ে নিতে চেষ্টা করুণ। এটা সম্পুর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। নিজেদের ব্যাপার, নিজেরাই ঠিক করতে হবে।

অনিয়মের কাজ যখন প্রতিদিন ঘটতে থাকে, চলতে থাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তখন মানুষের কাছে এই অনিয়মটাই হয়ে যায় একটা নিয়ম। যা দৃষ্টিকটু তা আর কটু মনে হয় না। লতার যখন তখন আসা যাওয়া, আনিসের ঘরে সময় কাটানো এসব মেসের অন্যদের কাছে আর বিসদৃশ্য লাগেনা। এটা যেন একটা নিয়মে দাঁড়িয়েছে। কেউ আর মাথা ঘামায় না। তাছাড়া আনিস খুব ভাল ছেলে তা সবাই জানে।

সেদিন আনিসের ঘরে চোখের জল শেষ করেছে। সামনেই টিভি চলছে। হঠাৎ একটা বিশেষ খবর পরিবেশিত হল। খবরটা এইরূপ: নর্থ কেরোলিনার সুসান স্মিথ নামে এক সুন্দরী মহিলা তার নিজের দু' সন্তানকে হত্যা করেছে। সুসানের স্বামী আছে। প্রেমের বিয়ে। পুরনো হয়ে গেছে বিধায় আর একটি প্রেম করেছে। এই প্রেমিক তার দু'সন্তানকে গ্রহন করতে রাজি নয়। এই কথা শুনে সুসান স্থির করল তার সন্তান দু'টিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিলেই তার প্রেমের পথ খোলা হয়ে যায়। তাই সে দুই এবং চার বছরের সন্তান দু'টিকে তার গাড়ীতে করে নিয়ে গেল লেকের পাড়ে। গাড়ীর দরজা বন্ধ করে লেকের জলে চালিয়ে দিল গাড়ী। তারপর পুলিশে রিপোর্ট করল তার গাড়ী একজন কালো মানুষ হাইজাক করেছে। পরে পুলিশ সব বের করেছে। শিশু দু'টির ছবি টিভিতে দেখাচ্ছে। এই খবর মানুষকে হতবাক করে দিয়েছে। আনিস আর লতা খবরটা শেষ হয়ে যাবার পরও স্তব্দ হয়ে রইল অনেকক্ষণ। এক সময় আনিস বলল, এই অমানুষিক প্রেমের কি প্রয়োজন ছিল? তার প্রেমিক যদি সন্তানের দায়ীত্ব গ্রহণ না করে তাহলে এমন প্রেম করতেই গেলি কেন? তাও যদি না হল, তাহলে বাচ্চাগুলিকে যে কোন শেল্টারে দিয়ে দিলেই তো হত! খুন করার কি প্রয়োজন ছিল! মানুষ পশুকেও হার মানায়। পশুও তো নিজের বাচ্চাকে হত্যা করে না!

লতা জিজ্ঞেস করল, তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছ বাচ্চা নিয়েই তার যাওয়া উচিত ছিল?

অবশ্যই! প্রেম করার সময় সে জেনেই প্রেম করেছে যে তার দু'টি সন্তান আছে!

লতা চুপ করে রইল। শিশু দু'টির চেহারা তার চোখে ভাসছে। সে তার নিজের দু:খের কথা ভুলে গেল। শিশু দু'টি মরণের সময় তাদের মা'কে ডেকেছিল নিশ্চয়ই! যে ডাইনী মা নিজেই হত্যা করল সে ডাইনী মা কি ভাবছিল তখন! এমনি ভাবতে ভাবতে সে আনমনা হয়ে গেল।

-৬৬-

আনিসের মেসে এখন মাত্র তিনজন আছে। আনিস তার রুমে একা। রফিক চলে গেছে আলাদা বাসা করে। হানিফ আগেই চলে গেছে। হানিফের জায়গায় ছিল ওসমান। সে তার সুবিধামত কোন কাজ পায়নি। অথচ প্রতি মাসে হানিফের স্ত্রীকে টাকা দিয়ে আসছে। মাস

দুয়েক হল সে মেস ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। সে রুম খালি থাকায় কাশেম চলে গেছে সে রুমে। জগলু এখন একাই থাকে তার রুমে। যখন তখন ঘরে আসে। কোন সময় বান্ধবী সাথে থাকে, কোন সময় একা।

মাঝে মাঝে একটা সুন্দরী মেয়ে নিয়ে আসে। ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেয়। মেয়েটা স্প্যানিস। মনে হয় যেন একটা ছবি। অনেক দিন আনিসের সামনে পড়ে গেছে। জগলু পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। প্রায়ই বান্ধবী বদল হয়। তার সাথে জগলুর কাজ বদল হয়। তার পাতিল কাল হয় না। বেশিদিন কোথায়ও টিকে না। কখনও বেকার থাকে, আবার কাজ নেয়। অড জবের কোন অভাব নেই এ দেশে। তবে বেশির ভাগ সে ছোট রেষ্টুরেন্ট বা ফার্ষ্ট ফুডের দোকানেই কাজ করে। ভাল না লাগলে ছেড়ে দেয়, না হয় ফায়ার্ড হয়ে যায়।

কিছুদিন হল সে একটা পুরনো গাড়ী কিনেছে। গাড়ী নিয়ে এসেই আনিসকে বলল, আনিস ভাই, গাড়ী কিনলাম একটা। আসুন, দেখে যান গাড়ীটা।

বাসার সামনেই পার্ক করা। আনিস গিয়ে দেখল খুব সুন্দর গাড়ী। মেরুন কালার। তত পুরনো নয়। হোন্ডা, ১৯৯০ মডেল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গাড়ী। আনিস খুব প্রশংসা করল। জিজ্ঞেস করল, কত নিল গাড়ী?

পাঁচ হাজার।

ভাল হয়েছে।

আপনার কোন কাজ থাকলে, কোথায়ও যেতে হলে আমাকে বলবেন।

গাড়ী কেনার পরই জগলুর ব্যস্ততা বেড়ে গেছে। নতুন নতুন বান্ধবী নিয়ে আসে, আবার সারাদিনের জন্য উধাও হয়ে যায়। গায়ানীজ একটা সুশ্রী মেয়ে আসত। অনেকদিন আর দেখা যায় না। তার জায়াগায় নতুন মুখ। একটা ইন্ডিয়ান মেয়ে আসে। এখন জগলু আড্ডা দেয় জ্যাকশন হাইটসে। বাঙালী ইন্ডিয়ান রেষ্টেরেন্টে। সেখানে বেশ কিছু বেচেলর মেয়ের সাথে তার পরিচয় হয়েছে। এইসব বেচেলর মেয়েরা কেউ কাজ করে, কেউ বেকার। বেশ কিছু মেয়ে কাজ করে জ্যাকশন হাইটসের স্বর্নের দোকানে, কাপড়ের দোকানে বা রেষ্টুরেন্টে। এখন জগলুর সময় বেশি কাটে সেখানে।

এই সব বেচেলর মেয়েরা কয়েক জন মিলে ঘর ভাড়া করে তারা এক সাথে থাকে। কেউ পরিশ্রমের কাজ করে দেশে নিজের পরিবারকে সাহায্য করে, ভাইবোন, মা বাপের খবরের জন্য উন্মুখ থাকে। চব্বিশ ঘন্টা মন পড়ে থাকে বাংলাদেশে, নিজের আপন জনের কাছে। আবার কেউ দেশের সাথে, আপন জনের সাথে কোন যোগাযোগই রাখে না। তারা এখানে স্বাধীনভাবে চলা ফেরা করে। আমেরিকার জীবন স্রোতে মিশে যেতে চায়। বয় ফ্রেন্ড নিয়ে চলাটা তারা মনে করে অনেকটা আমেরিকান হয়ে গেছে। তারা কেউ লিভ টুগেদার করে, কেউ বিয়ের চিন্তা করে। অনেকের কোন কাজ না থাকায় তারা অভাবে আছে। তাই তারা বয়ফ্রেন্ডের উপর নির্ভর করতে চায়। বয় ফ্রেন্ড খরচের হাতটা গুটিয়ে নিলেই নতুন ফ্রেন্ড খোঁজে। আর এক জনের কাছে যায়। কয়েক দিন থাকে। আবার বদল করে। এ ধরনের মেয়েদের নিয়ে অনেকের অনেক মন্তব্য। কেউ বলে তারা বারবণিতার খাতায় নাম লিখিয়েছে, পয়সা ছাড়লেই হাতে পাওয়া যায়। কেউ বলে তারা পাত্র খুঁজে।

এদের মাঝে বেশিরভাগই অবিবাহিতা। কিছু আছে বিবাহিতা। তাদের অনেকেরই কাগজ নেই। এদেশে এসেছে খুব সহজ ভাবে।

ভিজিট ভিসায়। তাদের প্রধান অংশটা বাংলাদেশে লায়ন ক্লাবের সদস্য। লায়ন ক্লাবের সদস্য হিসেবে এদেশে লায়ন ক্লাবে উপস্থিত হবার একটা নিয়ম আছে। আর সেই সুবাদে তারা ভিসা পেয়ে গেছে। এখানে এসে যে যেভাবে পারে কাগজের চেষ্টা করছে।

মানুষ যখন তার নিজের দলের লোক খোঁজে বেড়ায় তখন কিভাবে যে মিলে যায় তা কেউ জানে না। এই বেচেলর মেয়েরা এক জন আর একজনকে পেয়ে গেছে। তাদের মাঝে যোগাযোগ হয়েছে। তারা নিজেদের মত করে জীবন চালাচ্ছে। তেমনি যারা ক্রিড়াবিদ, তারা নিজেদের মানুষ খোঁজে বের করে ক্রিড়া সংগঠন করেছে, রাজনৈতিক নেতা, তস্য নেতারা রাজনৈতিক সংগঠন করেছে, কবি, সাহিত্যিক, সাহিত্যামোদিরা করেছে সাহিত্য পরিষদ। এমনি ভাবে সকলেরই সংগঠন হয়েছে।

যোগাযোগ হয়ে যায় তার মনের মানুষের সাথে। জগলুর সাথে যোগাযোগ হয়ে গেছে মারুফার। জগলু একটা রেষ্টুরেন্টে কাজ করত। একজন বাঙালী মেয়ে কাজের জন্য এসেছে। সাথে একজন বৃদ্ধ লোক। জগলু প্রথম মনে করেছিল মেয়েটার পিতা বা এমন কেউ। নিশ্চয়ই কাজের খুব প্রয়োজন। তাই বাঙালী জেনে সে তার ম্যানেজারকে বলল তাকে কাজ দেবার জন্য। ম্যানেজার জিজ্ঞেস করেছিল জগলু চিনে কিনা। কারণ এ দেশে সুপারিশের খুব মূল্য দেয়। জগলু বলেছিল তার বন্ধু। অনেক দিন থেকে চেনে। সেদিন থেকেই মারুফার কাজ হয়ে গেল। যাকে জগলু কোনদিন দেখেনি তাকে বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছে। মারুফা তার কাছে কৃতজ্ঞ। একদিন না যেতেই সত্যিই তারা বন্ধু হয়ে গেল। মারুফা তার সব দুঃখের কথা জগলুকে বলল। বলল, যে লোকটার সাথে সে এসেছিল তার নাম ছমিরউদ্দিন। মারুফার কেউ নয়। লোকটা তাকে সাহায্য করেছে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে আসার জন্য। প্রথমত সে বলত মারুফা তার মেয়ের মত। সে একটা সস্তা এপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে ব্রঙ্কসে। মাত্র দু'শ ডলার। বাসায় উঠার পরই সে মারুফার সাথে অন্যরকম ব্যবহার শুরু করেছে। তাকে মারুফা চাচা বলে ডাকে। ছমির তাকে চাচা বলে ডাকতে মানা করেছে। বলেছে, এদেশে সবই সম্ভব। এখন আর চাচা কেন। যতক্ষণ ঘরে থাকে ততক্ষন শুধু হাদিসের কথা শুনায়। আমাদের নবীকরিম (দ:) ষাট বছর বয়সে নয় বছরের বিবি আয়েশাকে শাদি করেছেন। পুরুষ এবং মহিলা একই ঘরে শাদি না করে থাকাটা কোন কোন হাদিসের আওতায় কি কি শাস্তি, সব পেঁচাল পারেন। একদিন বলল, বিয়ে করলে কেমন হয়? তখন মারুফা লোকটার মতলব বুঝতে পারল। যখন তখন মারুফাকে সে জড়িয়ে ধরতে চায়। সব সময় বলে, আল্লাহ সব মাফ করে দেয়। আল্লাহ মহা দয়ালু। মারুফা শেষ পর্যন্ত বলেছে, আমার সাথে এমন কিছু করার চেষ্টা করলে আমি পুলিশ ডাকব। পুলিশের ভয়ে আপাতত একটু ঠান্ডা। তার আশা আছে মারুফা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। ছমির বলেছে, মারুফা যেভাবে চলতে চায়, তার যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। ছমির নিজে থেকে মারুফাকে জিন্সের প্যান্ট, সার্ট কিনে দিয়েছে। বলেছে তুমি তোমার পছন্দমত পোষাক খরিদ কর। আমি সব টাকা দেব। উল্লেখ্য, ছমিরের গাটে কিছু টাকা আছে। যা এদেশে আসার সময় সাথে নিয়ে এসেছিল। সে টাকা যক্ষের মত বাচিয়ে রেখেছিল। এখন মারুফার জন্য দরাজ দিলে খরচ করছে। মারুফা এখান থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। তাই ছমিরকে বলেছিল একটা কাজের

ব্যবস্থা কি ভাবে করা যায়। ছমির কয়েকটা জায়গায় মারুফাকে নিয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই জগলুর এখানে কাজ হয়েছে।

সব শুনে জগলু বলল, তুমি ও বাসা ছেড়ে দাও।

তাহলে কোথায় যাব?

তোমার আপত্তি না থাকলে আমাদের মেসে সাথে থাকতে পার। একটা রুম তোমার জন্য খালি করে দিব। কোন অসুবিধা হবেনা।

ঠিক আছে বলে জগলুকে নিয়েই রওয়ানা দিল ব্রঙ্কসে। ছমির ঘরেই ছিল। যখন ঘর থেকে সুটকেসটা নিয়ে মারুফা বেরিয়ে আসে তখন ছমির জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় যাও? এখানে তোমার কি অসুবিধা?

এখানে কোন অসুবিধা নেই। যেখানে আরও সুবিধা পাব সেখানে যাচ্ছি।

জগলু বলল, চাচা আপনি দেশে চলে যান। আপনার ছেলেমেয়ের কাছে।

ছমির কোন কথা বলতে পারেনি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

মেসে যখন মারুফাকে নিয়ে জগলু ঢুকল তখন মাংশের গন্ধে সমস্ত ঘর ম ম করছে। আজ কামেশের ছুটি। সারাদিন বাজার করেছে। সব প্রিয় খাবার কিনেছে। গরুর সিনা তার খুব প্রিয়। আজ সিনা রান্না করছে। রান্নায় তার হাত খুব পাকা। ঘরে ঢুকেই জগলু বলল, কাশেম ভাই, মেহমান নিয়ে এসেছি। কাশেম চোখ ফিরিয়ে দেখে একটা কচি মেয়ে। মনে হয় বাংলাদেশের কোন গ্রামের একটা সরল সোজা মেয়ে। কাশেমের মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই মেয়েটাকেও সে কয়েকদিন ফুর্তি করে বাতিল করে দেবে? মেয়েটাকে সাহায্য করা দরকার।

জগলু মারুফাকে বলল, এই আমাদের কাশেম ভাই। রান্নার উস্তাদ। একবার খেলে আর ভুলবে না। কাশেম ভাই, এই হল মারুফা। একটা বিপদে পড়েছে। তাই নিয়ে এসেছি। আমাদের সাথে থাকবে। দরকার হলে আমি আপনার রুমে চলে যাব।

মারুফা সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমাকে রান্না শেখাবেন?

অবশ্যই শেখাব। তোমার চেহারাটা ঠিক আমার বোনের মত দেখতে।

আমি আপনার ছোটবোনই মনে করবেন।

রান্নাঘর পেরিয়ে লিভিং রুম। লিভিং রুমে ডাইনিং টেবিলে তখন লতা আর আনিস চা খাচ্ছিল। শান্ত একটা রবোট খেলনা নিয়ে ব্যস্ত। জগলু এগিয়ে এল। বলল, আনিস ভাই, এই মেয়েটা খুব অসুবিধায় পড়েছে। তাই নিয়ে এলাম। আমাদের এখানে থাকবে অন্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত।

আনিস বলল, ভাল করেছ। মারুফা এসে সালাম দিয়ে দাঁড়াল। লতা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখল। মেয়েরা মেয়েদের চিনতে পারে বেশি। এখন লতা মেসের সকলের সাথে সহজভাবেই কথা বলে। জগলুকে বলল, রাখবে কোথায় এ সুন্দরীকে?

ও যেখানে থাকতে চায়।

মারুফা বলল, আমি যে কোন জায়গায় থাকতে পারব। আমি বাঘের গ্রাস থেকে ছুটে পালিয়েছি। আমার একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন।

তারপর সংক্ষেপে তার কাহিনী ব্যক্ত করল। শুনে আনিস বলল, তাহলে তুমিই সেই হারানো বিজ্ঞপ্তির হারানো মাণিক? পত্রিকায় দেখেছি বিজ্ঞাপন। একজন তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এর মাঝে কাশেম এসে বলল, আমার ঘরটা খালি করে দিই। আমি চলে যাই জগলুর সাথে। সবাই মিলে সে ব্যবস্থাই করল।

লতা বলল মেয়েটা অনেকটা সরল সোজা মনে হয়।

আনিস বলল, এ পর্যন্ত যা দেখে এলাম তাতে কোথায়ও সোজা দেখিনি, বলে হেসে ফেলল।

তোমার চোখ বাকা, তাই সোজা দেখতে পাওনা।

কিন্তু আগুনের কাছে মোম থাকলে গলবেই। তাছাড়া মিয়া বিবি তো রাজি কেয়া কারেগা কাজি?

দুদিন পরেই জগলু খুব দামি ফার্নিচার কিনে ঘর ভরে ফেলল। সব মারুফার জন্য। এত দামী ফার্নিচার দেখে কাশেম আর আনিস চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। জগলু এত টাকা কোথায় পেল হঠাৎ?

সব রকম বান্ধবী আসা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। এখন শুধুই মারুফা আর মারুফা। যখন তখন বেড়াতে বেরিয়ে যায়। দূরে, বহুদূরে। সারাদিনের জন্য। নিরুদ্দেশের পথে।

-৬৭-

বাহারকে ফোন করল আনিস। বাহার ভাই, পত্রিকার হারানো বিজ্ঞপ্তির হারানো মানিক এখন আমাদের ঘরে।

কোন্ হারানো মানিকের কথা বলছ? এদের সংখ্যা তো অনেক।

সেই যে আপনি বলেছিলেন, মারুফারা ফিরে আসে না? সেই মারুফা। ফিরে এসেছে, তবে অন্য হাত ধরে।

তোমরা কিভাবে পেলে এই মানিক?

আমাদের কিছু হিরো আছে, তারা যোগাড় করেছে। তারপর সব বলল।

সব শুনে বাহার বলল, তুমি এবার মেস ছাড়। আর থাকা যাবে না এখানে। সেনবাবুর বাড়ীটা বিক্রি করে দিচ্ছেন। কুদ্দুস সাহেব ফোন করেছিল। গতকাল লিষ্টিংএ দিয়েছে। লিষ্ট করেছে কিরন। তুমি বাড়ীটা কিনে নাও।

দাম কত?

সাড়ে তিন লাখ চাচ্ছে। বাঙালি কেউ কিনলে দাম কমানো যাবে।

ডাউন পেমেন্ট কত দিতে হবে?

এটা তোমার ইচ্ছা। ৩% থেকে উপরে যত বেশি দেবে সুযোগ তত বেশি পাবে।

সেগুলো কি?

যেমন ধর তুমি যদি ২৫% ডাউন দাও তাহলে ইন্টারেষ্ট রেইট কম হবে। যত বেশি ডাউন দেবে ইন্টারেষ্ট রেইট তত কম হবে। যত কম ডাউন তত বেশি ইন্টারেষ্ট রেইট। ১৫/২০% ডাউন দেয়া তো তোমার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। এমন সুন্দর বাড়ীটা হাত ছাড়া করোনা। কিনে ফেল।

দেখি চাচার সাথে পরামর্শ করে।

চাচা শুনে খুব খুশি হলেন। ঠিক করলেন পরের দিনই যাবেন বাড়ী দেখতে। আনিস বাহারকে বলল, চলুন বাড়ীটা দেখে আসি। চাচা চাচীও যাবেন। বাহার বলল, আমার তো বাড়ী।দেখা আছে। অনেক বার সে বাড়ীতে গিয়েছি। তোমরা দেখে আস। চাচা চাচী আর আনিস বাড়ী দেখল। একটা ছবির মত বাড়ী। বাড়ীর তিন দিকে বাগান। দুদিকে বারান্দা। একটা বিরাট লিভিং রুম। আর একটা ডাইনিং প্লাস লিভিং। পাঁচটা বেড রুম। একটা ডেন। সকলেরই পছন্দ হয়েছে বাড়ী। সুসান বলেছিল এত বড় বাড়ী দিয়ে কি হবে?

চাচা বলেছেন, কি বল! বাড়ী কেনার পরই তো বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলব। দু'বছরের মাঝেই আশা করি নাতিনাতনীতে ঘর ভরতে শুরু করবে। এ তো আর আসল আমেরিকান নয় যে দু'একটা বাচ্চা নিয়ে বন্ধ করে দেবে! এ হল বাংলাদেশী আমেরিকান। তারা সন্তান জন্মের ব্যাপারটা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়। চলতে থাকে। তখন দেখবে এত বড় বাড়ীর কি প্রয়োজন। আমিও চাই ঘর ভরে যাক। আমিও দু'একটা নিয়ে আসব আমার কাছে।

চাচা নিজেই আলাপ করলেন সেন বাবুর সাথে। দাম ঠিক হল দিন লাখ বিশ হাজার। কিরন সাথে ছিল। টাকার কোন অসুবিধা নেই। আনিসের প্রয়োজন হলে চাচা দিতে প্রস্তুত।

অবশ্য চাচার সহযোগিতার প্রয়োজন পড়েনি। বাড়ীর অগ্রিম দিয়ে দু মাস পর ক্লোজিংএর তারিখ দিল।

বাড়ী প্রায় হয়ে গেল। এবার গাড়ী কেনা যায়। পাঁচটা গাড়ী রাখার পার্কিং আছে, আছে একটা গ্যারেজ। চোরের ভয় নেই। আনিসের স্বপ্ন। বিরাট বাড়ী, বিরাট মার্সিডিস গাড়ী, সুন্দরী সেক্রেটারি।

চাচা খুব খুশি। বললেন, এবার তোমার গাড়ী কিনতে পার। বাড়ী ক্লোজ হলেই গাড়ী কিনে ফেল। তোমার মা চলে আসছে। তারপর আমরা একটা বউ আনব।

-৬৮-

লতা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশে চলে যাবে। এতদিন সে অনেক ভেবেছে। মানসিক ভাবে সে জ্বলছে। দিন রাত। আর একটা পরিবার লতাকে তুষের আগুনে নিক্ষেপ করেছে। আগের স্ত্রী তালাক দিয়েছে সেটা না হয় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তার সন্তান? তার সন্তান সে অস্বীকার করবে কি করে? অস্বীকার করতে পারবে না বলেই সন্তানের খরচ বহন করে যাচ্ছে। এ চলবে সারা জীবন। আর মনে পড়বে সেই মহিলাকে। তার সন্দেহ হয় মহিলার সাথে তার এখনও দৈহিক সম্পর্ক আছে। সৈয়দ একটা লম্পট। তার দ্বারা সব কিছু সম্ভব। মহিলার সাথে সম্পর্ক মানে স্বামীর জীবনের অংশিদার! সবকিছুই সহ্য করা যায়। স্বামীর অংশিদারত্ব কোন স্ত্রীই সহ্য করতে পারেনা। লতা এমন স্বামী কল্পনা করেনি কোন দিন। সৈয়দ সম্মন্ধে তার আরও ধারণা জন্মে। যদিও তার কোন প্রমাণ নেই। সে ভাবে, সৈয়দ গভীর জলের মাছ। এখানে সে যেভাবে কাজকর্ম করে যাচ্ছে, একাত্তরের যুদ্ধের সময়ও সে এমনি কর্মঠ ছিল। তার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে সে কোন একটা দলের সাথে যুক্ত ছিল। একটা লম্পট। একটা লম্পট তার স্বামী হতে পারে না। লম্পটের কাছ থেকে সে দূরে চলে যাবে।

সৈয়দকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানাল। শুনে সৈয়দ সহজভাবেই বলল, ঠিক আছে কিছুদিন দেশ থেকে বেরিয়ে আস। তার ধারনা আত্মীয়স্বজনের কাছে কিছু দিন থাকলে লতার মনের পরিবর্তন হতে পারে। আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। লতা তাকে হয়ত ক্ষমা করে দেবে। বলল, কতদিন থাকবে?

ঠিক নেই।

টাকা পয়সা কত লাগবে? উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার বলল, ঠিক আছে, হাজার পঁচিশ সাথে নিয়ে যাও। তোমার যেভাবে ইচ্ছা খরচ কর। আরও যদি লাগে আমাকে জানালে সাথে সাথে পাঠিয়ে দেব। জিনিষ পত্র কি কি লাগবে, চল সব কিছু কিনে নাও। আত্মীয় স্বজন

সকলের জন্য উপহার নিয়ে যাও। যা ইচ্ছা তাই কিন। তোমার যেভাবে ভাল লাগে সে ভাবেই সব কিছু কর। যতদিন তোমার থাকতে ইচ্ছে হয় ততদিন থাক। তোমাকে ছাড়া এখানে আমার জীবনটা হয়ে যাবে একবারে ফাঁকা। বিশেষ করে শান্তর জন্য। আজই আমি ম্যানেজারকে বলব তোমার টিকেট আর রিজারভেশন করে ফেলার জন্য। এর ভেতর সব বাজার সেরে ফেল।

দিন তারিখ ঠিক হল।

বিন্দু শুনে বলল, ভালই তো। কিছুদিন ছকবাধা জীবন থেকে বাইরে থাক। মন ভাল থাকবে। কতদিন থাকবে?

ঠিক নেই। এক বছর, দু বছর, নাও আসতে পারি।

তা পারবে না। এসব বলে কাজ নেই। বরং বল তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেবে। নিজেও শান্তিতে থাকবে। তুমি পারবে না বেশি দিন থাকতে।

আপা, কি বলছেন আপনি?

বলছি এই জন্য যে, আমি নিউইয়র্কটা চিনেছি, তার কিছু মানুষও। একটা কথা মনে রেখ, জীবনে শান্তিটা বড় জিনিষ। অনেক সময় টাকা পয়সা ধন দৌলত শান্তি দিতে পারে না। নি:স্ব গরীব মানুষও অনেক শান্তিতে থাকে। আর জীবনটা একবারই আসে। তুমি বলছ দেশে গেলে নাও ফিরতে পার। পারবে কি? কারওর জন্য মন পড়ে থাকবে না?

একদম না।

তোমার চেহারা তা বলে না। আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, অনেক অভিজ্ঞ।

এমনি ধরণের অনেক কথা হয় বিন্দুর সাথে। যদিও যখন তখন কাছে যেতে পারে না। ফোনে প্রতিদিন কথা হয়। লতা বিন্দুকে বলল, আমাকে একটা উপকার করতে হবে আপা।

কি উপকার?

আমার বইগুলো রাখার ব্যবস্থা করতে হবে আপনার এখানে। সৈয়দ সাহেব তো বইএর কদর জানে না। তাছাড়া বাংলা বই। আমি বইগুলো আর গানের ক্যাসেটগুলো আপনার হেফাজতে রেখে যেতে চাই।

এত দূরে না রেখে বরং আনিসের ওখানেই রেখে দাও। তোমার বই সে খুব যত্নে রাখবে। তোমার জিনিস তার কাছে থাকলেই সবদিক থেকে ভাল হবে। সে খুব পড়ুয়া। বই কাজে লাগবে। তুমি আনিসের সাথে কথা বল।

আনিসের সাথে কথা হল। বলল, আমার বইগুলো কি করব এ নিয়ে ভাবছি। বিন্দু আপা বললেন তোমার কাছে রেখে যেতে। সৈয়দ বইএর মর্যাদা দিতে জানে না। তোমার ওখানে রাখলে তোমার কোন অসুবিধা হবে?

আসলেও আপনি খুব খুঁত খুঁতে স্বভাবের মনে হয়। ওখানে বই রাখলে কিছু হবে না। পোকায় খাবেনা। আর যদি অগত্যা রাখতেই চান তা হলে আমার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শ'দুয়েক বই একবারে কম নয়। তার জন্য একটা শেল্‌ফ লাগবে । এতগুলো বই আনার জন্য একটা গাড়ী লাগবে।

বাহার ভাই নিজের গাড়ী দিয়ে সাহায্য করবে। একটা বুক শেল্‌ফ কিনতে হবে।

বুক শেল্‌ফ কেনা হল। সব বই বাহারের গাড়ী দিয়ে আনা হল। সৈয়দ এসব খেয়ালও করেনি।

আনিসের সাথে গল্প হয়। দেশে যাবার গল্প। লতা বলে, আমি চলে গেলে তোমার সময় খুব ভাল কাটবে। কেউ এসে বিরক্ত করবে না।

আপনি ফিরে এসে তো আমাকে এখানে পাবেন না। নতুন বাড়ীতে চলে যাব। নতুন বাড়ীতে গেলে তখন কি হবে? যখন তখন তো আর আসতে পারবেন না। এত দূরে যাবেনই বা কি করে। তাই আগে থেকেই অভ্যেসটা বদলে যাক।

গল্প হয় দেশে গিয়ে কি করবে, কি ভাবে সময় কাটাবে এসব। লতা বলে, চেষ্টা করবে সব কিছু ভুলে থাকতে। এমন সব কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে যে এখানকার কথা মনেই আসবে না। এমনি করে লতার যাবার দিন এসে গেল। আগামী কাল তার ফ্লাইট।

আনিসকে বলল, কাল তো তোমার সাথে দেখা হবেনা। তোমার কিছু দেবার থাকলে দিয়ে দাও।

মা'র জন্য কিছু দেবার নেই। মা তো চলেই আসবে। জিনিষপত্র পাঠিয়ে লাভ কি? কোন জিনিষ দেবনা। শুধু একটা চিঠি দেব। আপনি পৌঁছেই মা'র সাথে দেখা করবেন। মা খুব খুশি হবেন। কতদিন থাকবেন?

মনে হয় আমি চলে গেলে তুমি খুশি।? আমি কতদিন থাকব জানি না। মন যদি ঠিক না হয় নাও আসতে পারি।

আরে স্বামীস্ত্রীর মাঝে এমন ঝগড়ঝাটি হয়েই থাকে। আবার মিটে যায়। দেশে গেলেই দেখবেন আপনার মন বদলে গেছে। ঘরে ফেরার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে পড়বে। তখন কেউ আপনাকে আটকে রাখতে পারবেনা।

তুমি বুঝতে পারছনা! এটা ঝগড়া নয়! এটা মনের ব্যাপার। দেশে গিয়ে মন যদি আরও বিগড়ে যায় তাহলে কি হবে? যদি সাংঘাতিক কিছু করে বসি? তুমি যা কল্পনা করতে পার না? কারণ তোমার মন বলতে কিছু আছে বলে প্রমাণ পাইনি।

না ভাই, আপনাকে নিয়ে গবেষনা করিনি। প্রয়োজনও হয়নি। আপনার চোখে যখন তখন জলের ধারা বইতে দেখেছি। মনে করেছি সাময়িক জলধারা। ষ্টক শেষ হয়ে গেলে এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে। এখন দেখছি ষ্টক শেষ হচ্ছে না। তাহলে তো ভাবতে হয় আপনার মানসিক অবস্থার কথা!

আমি কোন্ অবস্থায় কেন দেশে যাচ্ছি তা কি টের পেয়েছ না বুঝতে চেষ্টা করেছ?

আমার সরল বুদ্ধিতে আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি আপনার সংসারটা নিয়ে আপনি খুব ভাবছেন। সৈয়দ সাহেবের কর্মকান্ড নিয়ে আপনি জ্বলে পুরে মরছেন। এমন তো হয়েই থাকে। এই বিদেশে অনেকেই তো এমনি কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ করে কাগজ তৈরি করেছে। এখানে এটাকে অপরাধ বলেই গণ্য করে না অনেকে।

সব অপরাধ সকলের কাছে সমান গুরুত্ব পায় না। লোক বিশেষে অপরাধের তারতম্য হয়। অপরাধের কথা ভাবি, ভাবি প্রতারণার কথা। আমার ছেলের ভবিষ্যতের কথা। সৈয়দের আর এক ছেলে আছে সেটা সে গোপন রেখেছে। তার উদ্দেশ্য ঠিক বুঝতে পারিনা। ড্রাইভারের কাছ থেকে খবর নিয়ে জেনেছি কালি মাগিটা মাঝে মাঝে অফিসে আসে। এসব আমি চিন্তা করতে করতে আমার মাথাটা বুঝি খারাপ হয়ে যাবে! কোন কিছুতেই মন দিতে পারি না। এভাবে তো একটা মানুষ বাচঁতে পারে না!

আপনি কিছুদিন ঘুরে আসুন। দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

ঠিক আছে, যাচ্ছি। তবে আর আসব কি না জানি না! তোমার সাথে আর দেখা নাও হতে পারে!

আমার মন বলছে, আবার দেখা হবে এবং খুব শীগঘিরই। বেশিদিন থাকতে পারবেন না। তাহলে এখানকার এসব কাজ চলবে কি করে? নিউইয়র্ক শহর চলবে কি করে? সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে যে!

আমার চলে যাবার সাথে নিউইয়র্ক শহরের কি সম্পর্ক?

তা জানি না। তবে আমি ঘরে ফিরে দেখব সব এলোমেলো হয়ে আছে! আমার কাজকর্ম খাওয়াদাওয়া কেমন করে চলবে জানি না! কিভাবে কি হয়ে গেল! মনের অজান্তে আমি আপনার উপর নির্ভর করে ফেলেছি! আমার রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া সব কিছু কখন যে আপনার হাতে চলে গেছে তা আপনিও জানেন না! আমার অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। আমি অলস হয়ে গেছি। আপনার সাথে পরিচয় না হলে হয়ত আমি আমার নিজের এসব কাজ একটা নিয়মের ভেতর দিয়ে যেভাবেই হোক চালিয়ে যেতাম। এখন আমি অভ্যস্থ হয়ে গেছি পরের উপর নির্ভর করা। আমি জানি না মা আসা পর্যন্ত আমি কি করে মেনেজ করব।

একজন মানুষ না থাকলে পৃথিবীর কোন কাজ বন্ধ হয়ে থাকে না। তোমার চিন্তা শুধু মা আসা পর্যন্ত কি ভাবে চলবে । আর কিছু নয়?

একটা অভাব পড়ে যাবে পৃথিবীব্যাপি। একটা হাহাকার! সে অভাব পূরণ হবে না।

কিসের হাহাকার?

একজনের অভাবে এই নিউইয়র্ক শহর ফাঁকা হয়ে যাবে। সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে!

তোমার তো কিছু হবে না। তোমার টুকটাক কাজগুলো করে দেবার জন্য একজনের প্রয়োজন। আর কিছু না।

'আর যাহা আছে মনে তাহা প্রকাশের নহে' দেবী!

তাহলে তুমি প্রকাশ করতেও জান না?

আমি ভীরু, কাপুরুষ! সাহস করে কিছুই বলতে পারি না। আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়াতে দু:সাহস করতে পারি না! শুধু তাকিয়েই থাকি।

চাঁদ কত দূরে তা কি কোন দিন খোঁজে দেখেছ?

বহু যোজন দূরে। মানুষের নাগালের বাইরে।

না, এখন চাঁদে মানুষ পৌঁছে গেছে! সাহস করে। তোমার সাহস নেই। তাই হাত বাড়াতে পার না।

সাহস আছে, শক্তিও আছে। এই দেখুন, বলে লতাকে জড়িয়ে ধরল। বুকের সাথে বুক মিলিয়ে অনেকক্ষন চেপে রাখল। লতা চোখ বন্ধ করে লতার মত নেতিয়ে রইল। মনে হয় যেন একটা পুতুল, একে নিয়ে যেভাবে ইচ্ছে খেলা করা যায়। লতার হাতও এক সময় আনিসের গলা জড়িয়ে ধরল। অনেকক্ষন। নিথর, স্তব্ধ। শুধু দুজনের নি:শ্বাসের আওয়াজ শোনা যায়। আকাশের চাঁদ এখন হাতের মুঠোয়। কল্পনা যখন বাস্তবে রূপ নেয় তখন মনে হয় অবিশ্বাস্য। বাস্তবকে পরখ করার জন্য তাকে ব্যবহার করে দেখে। আনিস তার এতদিনের কল্পনাকে পরখ করল। একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল, আজ আমার জীবন স্বার্থক।!এতদিনের কল্পনা এখন বাস্তবে রূপ নিল!

লতা কম্পিত কণ্ঠে বলল, ছাড়! তাহলে তুমি এসব কল্পনা করতে? আমাকে নিয়ে? কোন দিন ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি!

কি করে টের পাবেন! পরের স্ত্রীকে নিয়ে এমন সব অদ্ভুত কল্পনা রীতিমত অন্যায়! বাস্তবে রূপ দিয়ে আরও কত বড় অন্যায় করলাম জানি

না! জানতেও চাই না! আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই নিউইয়র্ক শহর কাঁদবে, কাঁদতেই থাকবে!

লতা কোন কথাই বলতে পারল না। সে যেন অন্য জগতে চলে গেছে।

-৬৯-

আজ লতার ফ্লাইট। সন্ধ্যা সাতটায়। সকাল থেকেই সৈয়দ খুব ব্যস্ত। লতার যা প্রয়োজন সব বাধা ছাদা করছে। সমস্ত কেনাকাটা সৈয়দ একাই করেছে। লতা একদিনও যায়নি বাজারে। তার কোন কিছু কেনার ইচ্ছে নেই। সে কারও জন্য কিছুই নিতে চায় না। সে বেড়াতে যাচ্ছে না। আনন্দ করতে যাচ্ছে না। তাই তার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। সৈয়দ যথেষ্ট কেনা কাটা করেছে। লতার পরিবারের সকলের জন্য দামী উপহার, লতার আত্মীয় স্বজনের জন্য উপহার। বড় বড় দুটা সুটকেইস ভর্তি। একটা সুটকেসে লতার কাপড়চোপড়। একটা বড় গাড়ী দরজায় প্রস্তুত। সব লাগেজ উঠানো হয়েছে। সৈয়দ সাহেব শান্তর হাত ধরে দাড়িয়ে লতার জন্য অপেক্ষা করছে।

লতা প্রস্তুত। মানুষ যখন অনেকদিন একই জায়গায় বাস করে তখন তার একটা প্রেম জন্মে যায়। আকাশের সাথে, বাতাসের সাথে, বৃক্ষ, মাটি, পথ ঘাট আর চারপাশের মানুষের সাথে। ঘর বাড়ী আসবাব পত্র, প্রতিদিনের কাজকর্ম আর অভ্যেসের সাথে। তার অজান্তে একটা শক্ত শেকড় মাটির নীচে বহুদূর চলে যায়। যা ইচ্ছে করলেই সহজে উপড়ে ফেলা যায় না।

অভ্যেসবশত: মনের অজান্তেই রান্নাঘরে গেল লতা। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে চুলা চেক করা তার অভ্যেস। কোনটা জ্বালানো আছে কি না। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে নিজের বেড রুমে গেল। তার সখের বেড রুম! কত দামি দামি ফার্নিচার-জিনিষপত্র দিয়ে সাজিয়েছে। দিনে দিনে। মনে পড়ে প্রথম যখন এখানে এসে পৌঁছল তখন সৈয়দ সাহেব বলেছিল তোমার পছন্দমত বেডরুম সাজিয়ে নাও। টাকার কোন চিন্তা করো না। তোমার যা পছন্দ হয় তাই কিনবে। তারপর কত দোকান দেখে, বড় বড় ফার্নিচারের দোকান ঘুরে, একটা একটা করে পছন্দ করে কিনেছে। সেরা দোকানের সেরা সব জিনিষ। এতদিন মনে করত এসব তার। এখন মনে হয় এর অংশিদার আছে। মনে হলেই তাকে পীড়া দেয়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ভেতরটা। ড্রেসিং টেবিলের দিকে নজর গেল। তার প্রতিবিম্ব পড়েছে আয়নায়। একি! একি তার চেহারা সে দেখছে! এই ক'দিনে এত পরিবর্তন! চোখের কোনে কালি পড়েছে। বয়স মনে হয় দশ বছর বেড়ে গেছে! সে চলে গেলে এই বেডে আর কেউ কি এসে ঘুমাবে? নাকি সৈয়দ একা থাকবে। প্রতি রাতে তাকে মনে পড়বে? কি জানি। সৈয়দকে আর বিশ্বাস করতে পারে না। এ ঘর থেকে সে ঘর। শান্তর ঘরে গিয়ে তার চোখ জলে ভিজে গেল। শান্তর খেলনা সমস্ত ঘর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। খেলাশেষে যেটা যে অবস্থায় ছিল তেমনি আছে। এসব গোছানো হয়না কখনও। গুছিয়ে রাখলে দশ মিনিট পরই আবার এলোমেলো হয়ে যায়। তার স্কুল ব্যাগ তার বিছানার উপর পড়ে আছে। মনে হয় এখনই স্কুলে যাবে। চোখ মুছে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে।

সৈয়দের পাশে গাড়ীতে বসে একটা কথাও বলেনি লতা। সৈয়দ সাহেব অনেক কিছু বলে যাচ্ছে। শান্তর দিকে বিশেষ ভাবে খেয়াল

রাখতে হবে। খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে পানি। বোতলের পানি পান করতে হবে। অনেক রকমের উপদেশ। এসব লতার কানে পৌঁছুচ্ছে কিনা বুঝা যাচ্ছে না। লতা কি ভাবনা নিয়ে বিভোর কে জানে! উদাসভাবে গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। মনে হয় কিছুই দেখছে না।

ডিপারচার লাউঞ্জে মালামাল লাইনে দিয়ে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে। লতার লাইন এক সময় কাউন্টারের কাছে চলে এল। লতা খুঁজছে কি যেন। কোথায়ও দেখা যাচ্ছেনা। আনিস আসবে বলছিল। তার মাকে চিঠি দেবে। কৈ, কোথায়ও দেখা যাচ্ছে না। সময় আর বেশি নেই। লতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। বেশ কয়েক মিনিট পর হন্তদন্ত হয়ে আনিস এসে পৌঁছল। হাতে একটা খাম।

লতার সামনে পৌঁছার আগেই পড়ে গেল সৈয়দের সামনে। সেলামালেকুম, কেমন আছেন?

ভাল আছি। চিঠি দিবে?

হ্যা, মাকে একটা চিঠি দিচ্ছি।

চেক-ইন লাইনে লতা দাঁড়িয়ে আছে। আনিস এগিয়ে গিয়ে লতার হাতে চিঠিটা দিয়ে বলল, পৌঁছেই কিন্তু মা'র সাথে দেখা করবেন। তারপর একটু পিছিয়ে এসে সৈয়দের পাশে দাড়াল।

আনিস মা'কে চিঠি লিখেছে। দীর্ঘ চিঠিতে শুধুই লতার কথা। লতায় ভরে আছে সবটা চিঠি। কিভাবে আনিসের সমস্ত কাজকর্ম, রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়ার খোঁজ খবর রেখেছে সব কথা লিখেছে। লিখেছে লতা না থাকলে এখানে তার কি কষ্ট হত, না খেয়ে হয়ত থাকতে হত এসব। লতা থাকায় সে কোন কিছুর অভাব বোধ করেনি। সে যে বিদেশে আছে সে কথাই ভুলে ছিল। এখন সে কিভাবে এসব কাজ করবে জানে না। শুধু লতা আর লতা। সবশেষে লিখেছে, লতাকে খুশি করার জন্য আপ্যায়নের যেন কোন ত্রুটি না হয়।

লাইনে দাঁড়িয়ে লতা তাকিয়ে আছে। দুজন পাশাপাশি। আনিস আর সৈয়দ। দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, শরীরের প্রতি খেয়াল রেখ। খাওয়া দাওয়া ঠিকভাবে করো। খোদা হাফেজ বলে শান্তর হাত ধরে এগিয়ে গেল।

কি জানি কা'কে উদ্দেশ্য করে বলল। সৈয়দ সাহেব উত্তর দিল, আমার জন্য কোন চিন্তা করোনা। তোমাদের নিজেদের প্রতি খেয়াল রাখবে। সাবধানে চলাফেরা করবে।

আনিস তৃতীয় পক্ষ। তার উদ্দেশ্যে এই আদেশ জারি হয়নি নিশ্চয়ই। সে চুপ করে রইল।

লতা চোখের আড়াল হয়ে গেলেও আনিস আনমনা কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় ফিরে দেখে সৈয়দ সাহেব নেই। কখন চলে গেছে।

ঘরে ফিরে আনিস সত্যিই হাহাকারে পড়ে গেল। কি যেন নেই, কি যেন বাকী রয়ে গেছে! পৃথিবীটা যেন ফাঁকা। কেউ নেই, কিছু নেই। শূন্যতা আর শূন্যতা চারদিক। মন চলে গেছে লতার সাথে বাংলাদেশে।

-৭০-

কাশেম রাজনৈতিক আশ্রয়ের দরখাস্ত করেছে এটর্নী স্যান্ডন ওয়াকারের মাধ্যমে। দু বছর হয়ে গেল কোন খবর নেই। ইন্টারভিউর জন্য ডাকেনা। ওয়াকার বলেছিল যখন ইমিগ্রেশন থেকে চিঠি আসবে তখন কাশেমকে সে জানাবে। এক বছর আগে এ কথা শুনে কাশেম

অপেক্ষা করছে। ওয়াকার কিছুই জানায়নি। কয়েকদিন যাবত টেলিফোন করে কোন যোগাযোগ করতে না পেরে কাশেম ওয়াকারের অফিসে গেল। অফিস বন্ধ। কেউ নেই। কোন নোটিশ নেই। ব্যাপার কি! এত লোক গেল কোথায়? আমাদের বাংলাদেশী দুজন উকিল তার সাথে কাজ করে। ওয়াকারের কাছে বাঙালীরা বেশি আসে। তাই ওয়াকার দুজন বাঙালী উকিল রেখেছে। সব কাহিনী লিখে ওয়াকারের হাতে দেয়। তারপর ওয়াকার ইমিগ্রেশনে দাখিল করে। বাঙালী উকিলরা গেল কোথায়? অফিস কি বদল করেছে? না, কোন নোটিশ নেই। অফিস বদল করলে মক্কেলদের অবগতির জন্য একটা নোটিশ অবশ্যই থাকা উচিত। কি হতে পারে! কাশেম দাঁড়িয়ে ভাবছে। এমন সময় আরও দুজন ভিনদেশী মক্কেল হাজির। সকলেরই এক কথা। অফিস বন্ধ কেন? গেল কোথায়? আর একজন গায়ানীজ এসে বলল, ওয়কার তো এক বছর আগেই গ্রেফতার হয়েছিল। এতদিন সে বেলে ছিল। গত সপ্তাহে তার সাজা হয়ে গেছ। ২৬০ বছর জেল হয়েছে। টরন্টো স্টারে দেখনি খবর? তার বিরুদ্ধে ৫৫টা জালিয়াতির মামলা প্রমাণিত হয়েছে। গত দু বছর যাবত তার পেছনে এফবিআই আর ইন্টিলিজেন্সের লোক লেগে ছিল। সব প্রমাণিত হয়েছে। এখন সে লাল ঘরে। আমি এসেছিলাম দেখতে। যেসব মামলা এখনও চলতি সেগুলোর কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, বা অফিসে তার কোন রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে কিনা। মনে হয় ওয়াকারের জেল হবার সাথে সাথে তার হাতের সব মামলাও জেলে চলে গেছে। অফিস আর খুলবে বলে মনে হয় না।

তাহলে অফিস আর খুলবে না?

মনে হয় না।

কাশেম ভাবতে লাগল এখন তার কি হবে? নতুন করে আবার দরখাস্ত করা যাবে না। মামলা অন্য উকিলের কাছে দিতেও ঝামেলা। ওয়াকার আসলে কি লিখেছিল তার কোন কপি নেই।

সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে কাশেম চলে এল রফিকের রেস্টুরেন্টে। রেষ্টুরেন্ট বেশ জমেছে। রফিক ছাড়াও চার জন কাজ করে। দেশি বিদেশি গ্রাহক প্রায় ভর্তি। কাশেমকে দেখে রফিক খুব খুশি হল। এক কোণে বসিয়ে বলল, এখন খুব ব্যস্ত। একজনকে ডেকে বলল, এই, এখানে একটা চপ দাও, আর এক কাপ কফি। রফিকের সাথে আলাপ করে জানতে পারল ওয়াকারের মামলা কেউ নেয় না। আর বাঙালী যে দুজন উকিল ওয়াকারের সাথে কাজ করত, তারা যখন দেখল ওয়াকারের শাস্তি হয়েই যাচ্ছে, রাতারাতি দেশে চলে গেছে। তারা আর ফিরবে না। কাজেই এই দরখাস্তের কথা ভুলে যান। যদি ইমিগ্র্যাশান থেকে চিঠি দেয় তখন দেখা যাবে।

রেষ্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে কাশেম ভাবতে লাগল। এখন কি করা যায়! আর কি পথ খোলা আছে কাগজ পাবার? একমাত্র পথ কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ। এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় বাসায় পৌঁছল। অভ্যেস বশত: লেটার বক্সটা একবার দেখে। স্ত্রীর কোন চিঠি আছে কি না। বাংলাদেশ থেকে চিঠি লেখার আর কেউ নেই। শুধু তার স্ত্রীই লেখে। কোন্ কোন্ পাওনাদারদের কি কি প্রস্তাব, কারা বেশি অসুবিধা করছে, এসব। চিঠির বাক্স খুলে দুটা চিঠি বের করল। দুটাই তার নামে। তার নামে তো এ ধরনের কোন চিঠি আজও আসেনি। তাড়াতাড়ি করে খুলল। ক্রেডিট কার্ড কোম্পানীর চিঠি। একটাতে দেনা চার হাজার নয় শত ডলার, আর একটাতে দু হাজার আট শত ডলার। অবশ্য নীচের দিকে কোনে লেখা আছে মিনিমাম কত দিতে হবে। তারা সব টাকা এক বারে চায় না।

যেন কাবুলিওয়ালা। আসলি নেহি মাংতা। কাশেমের মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। বার বার কয়েক বার পড়ল আগাগোড়া। তার নামটা দেখল। না, কোন ভুল নেই। এই চিঠি তার নামেই। কিন্তু এই টাকা তারা কিভাবে তার কাছে পাওনা? কি কারণে? নিশ্চয়ই ভুল করে এসব চিঠি দিয়েছে। সে ঘরে ঢুকল।

এখন তার রুমে থাকে আক্কাস। পাশের রুমে থাকে রুবেল আর জয়ন্ত। জগলু চলে গেছে দু মাস হল। মারুফাকে নিয়ে আলাদা বাসা করে। যাবার সময় বলে গেছে সব ঠিকঠাক করে একটা পার্টি দেবে, তখন সবাইকে দাওয়াত করবে। তখনই ঠিকানা দেবে, ফোন নাম্বার দেবে। এখনও কোন দাওয়াত পাওয়া যায়নি। তবে আশা আছে। জগলু যাবার আগেই বাঙালী গ্রোসারীতে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল কাশেম। রুম মেট আবশ্যক। দুদিনের মাঝেই লোক পেয়ে গেছে। আক্কাসের কাগজ আছে। পরিবার চলে আসবে। আক্কাস তখন নামাজ শেষে নামাজের মসলাহ ভাজ করছে। কাশেম বলল, দেখুন তো আক্কাস ভাই। এই চিঠির ব্যাপারটা কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তো কোথায়ও কোন কিছু কিনিনি। মনে হয় ক্রেডিট কার্ডের বিল। আমার কোন ক্রেডিট কার্ড নেই, জানিও না কিভাবে করতে হয়। এটা কি ভুল করে আমার নামে চলে এসেছে?

আক্কাস দেখে বলল, হ্যা, এগুলো ক্রেডিট কার্ডের বিল। আপনি না কিনলে তবে কে কিনল? তারা তো এমন ভুল করেনা। বরং আপনি কোথায়ও ভুল করছেন। ভাল করে খেয়াল করে দেখুন।

খেয়াল অনেক করেছি। আমার কোন কার্ড নেই।

আক্কাস এই ব্যবসাটা ভাল বুঝে। গ্রীন কার্ড পাবার পরই বাংলাদেশে গিয়েছিল। টিকেট করেছিল এক বাঙালী ট্র্যাভেল এজেন্সি থেকে। প্রায় এক বছর পর্যন্ত তার ক্রেডিট কার্ড নাম্বার ব্যবহার করেছে সেই এজেন্সি। প্রায় চার হাজার ডলার খরচ দেখিয়েছে। সে কিছুই জানে না। সে নিয়ে আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে মামলা। শেষ পর্যন্ত ট্র্যাভেল এজেন্সি নিখোঁজ। অবশ্য আক্কাসকে সে সব টাকা দিতে হয়নি। এ ধরনের আরও ঘটনা আক্কাস জানে। সে জিজ্ঞেস করল, আপনার কাগজপত্র কোথায় থাকে? এই ধরুন আপনার সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, আইডি কার্ড এসব?

আমার বালিশের নীচেই রাখি।

আপনার সাথে আর কে থাকত?

জগলু ছিল আমার রুমমেট।

আমার তো মনে হয় অন্য কেউ আপনার নামে এসব করেছে। আপনি খোঁজ নিন। ক্রেডিট কোম্পানীকে কল করুন। সব জানতে পারবেন।

কাশেমের মনের অবস্থা খুবই খারাপ। সে কি করবে ঠিক করতে পারছে না। টিঠিগুলো নিয়ে সে আনিসের ঘরে এল। আনিস তখন একটা বাংলা খবরের কাগজ পড়ছিল। কাশেমের পেছনে আক্কাসও এল। কাশেম বলল, আনিস সাহেব, এখন বলুন তো আমি কি করি। এই বলে সমস্ত কিছু দেখাল। তারপর তিন জন বসে ছোটখাটো একটা সভা হয়ে গেল। আনিস আক্কাসের সাথে এক মত। জগলু হঠাৎ এত টাকা কোথায় পেল? ঝকঝকে তকতকে গাড়ী, দামী ফার্নিচার। তখনই কাশেমের খেয়াল হল। তাইত! নিশ্চয়ই জগলুর কাজ। সাথে সাথে ক্রেডিট কার্ড কোম্পানীকে ফোন করল। অভিযোগ করল ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির।

ক্রমশঃ...